Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 219 - 228
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ

অমিত মজুমদার
Email ID: amitmazumdar56@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Tara Shankar, Hansuli Banker Fables, Novels, Regional, Spoken Language,

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay's name is remembered forever among the few novelists whose names appear as bright stars in the history of Bengali literature since the eve of the Second World War. Vibhutibhushan Bandyopadhyay, Manik Bandyopadhyay, Banaphool (Balaichand Mukhopadhyay) and Tarashankar Bandyopadhyay. Tarashankar Bandyopadhyay 's name will be written in golden letters among these writers. Tarashankar Bandyopadhyay, the legendary lyricist of Birbhum and Bengal, has highlighted the normal life of people through his writings. He has eloquently expressed the folk culture and folk life of Greater Bengal through the regional spoken language. In Tarashankar's literary works, the sense of usual life and feudalism of Greater Bengal has come up many times. Regional novels like "Hansuli Banker Upaktha" have been developed focusing on the lifestyle, social thought and spoken language of Kahar Para, a bamboo village on the banks of the famous Hansuli bend in the middle of the Kopai river. This novel, written entirely in regional spoken language, is still appreciated by the readers. The novel 'Hansuli Banker Upokatha' has been portrayed by the novelist with skill while keeping the regional colloquial language of the usual life of Kahars unchanged. Kahars' life struggle, manners, happiness, sorrow, customs, reforms, and natural background, which give this novel an unprecedented structure. The qualities of a vernacular novel that move the reader's mind are present in this novel. Therefore, the novel "Hansuli Banker Upaktha" is superior in terms of regional novels. The specialty of Hansuli Banker Upaktha is the expression of the depth of the regional spoken language. Tarashankar Bandyopadhyay has created a stir in Bengali fiction by using the regional spoken language in this novel. After all, it is a novel that creates

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

sweet relationship of latent happiness between the novelist and the reader, which is inexhaustible and impeccable.

Discussion

"তারাশঙ্করের উপন্যাসে বীরভূম খ্যাত হলো,
কোপাই নদী চলার পথে হাঁসুলী বাঁক নিলো।
উঠে এলো সেই কাহারসমাজ,
কথ্য তাদের ভাষা।
রাঢ়ভূমির লাল মাটিতে ছিল ভালোবাসা।
জীবন ছিল সহজ-সরল মন যে তাঁদের খাঁটি।
ধন্য ধন্য মোদের বীরভূমের এই মাটি।।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার সূর্যালোক যখন পশ্চিম গগনে অস্তগামী এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জোৎস্না যখন ম্লান হয়ে এসেছে, যখন দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে অস্থিরতার স্পর্শ এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যারম্ভ পূর্ব গগনে উঁকি দিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকে বাঙ্গলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তারাশঙ্করের লেখনীর স্পর্শে বাঙ্গলা কথা সাহিত্য নবরূপে নবপ্রাণে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বীরভূম তথা বাঙ্গলার কালজয়ী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার পরতে পরতে তথাকথিত সমাজের অন্তজ শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনচর্চা ও কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের মধ্যে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। অঞ্চল বিশেষে সংস্কৃতির জীবন্ত উপাদান ও উপকরণের মূল আধার হচ্ছে কথ্যভাষা বা লোকভাষা। এই লোকভাষা বা আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ্ মোঃ এনামুল হক বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, ১ খন্ডে বলেছেন,

> "কথা ও গল্প বলার প্রবৃত্তি মানুষের একটি বিশিষ্ট প্রাচীন অভ্যাস। এই অভ্যাস বসে আমাদের দেশে যে সমস্ত কথা শুনতে পাওয়া যায়, রসবোধের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ব্রতকথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাকথা, শ্রুতিকথা ও কেচ্ছা-কাহিনি নামে অভিহিত করা হয়।"[১]

এছাড়াও লোককথা প্রসঙ্গে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন,

> "লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে এই সম্পদ সংহত সমাজের মনটিকে ধরে রাখে।"[২]

লোককথার সংজ্ঞা রূপে দিব্যজ্যোতি মজুমদার যা বলেছেন তা 'হাঁসুলী বাঁকের রূপকথা' -উপন্যাসে জীবন্ত রূপে বিকশিত হয়েছে। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কাহারপাড়ার সমাজ জীবনে আঞ্চলিক কথ্যভাষা কতটা গুরুত্ব বহন করেছে, তা তিনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। বীরভূম ও অধুনা পূর্ব বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরী, বাউল কাহার ও গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে তিনি সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন আপামর বাঙ্গালী জাতির কাছে। বীরভূমের যে লাভপুর গ্রামের তাঁর বেড়ে ওঠা, সেই পরিবেশ-প্রকৃতি ও সেখানকার মানুষের জীবন চর্চার কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর রচনায়,তাই তিনি কথাশিল্পী।

আজও লালমাটির বীরভূমের উপর দিয়ে যেতে যেতে যদি কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী হঠাৎ তার পেশীবহুল চেহারা নিয়ে হাজির হয়, চপলা কালোশশী চরণের চঞ্চল ছন্দের তরঙ্গ তুলে পথ হেঁটে যায়, সাহেবদের মতো কোট প্যান্ট পড়ে মাথায় টুপি নিয়ে যদি করালী এসে দরজা নাড়ে তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তারাশঙ্কর শিকড়ের সন্ধানে তাঁর চেনা মাটির দেশের মানুষদের আঞ্চলিক কথোপকথনকে ব্যবহার করেছেন। মানুষের ভেতরকার আদিম প্রবৃত্তিকে তিনি আঞ্চলিক কথ্যভাষার মধ্যদিয়ে উপন্যাসের পরতে পরতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্নচিত্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তিনি আঞ্চলিক কথ্যভাষার রস-মাধুর্যকে পাঠক মহলে উপহার দিয়েছেন এবং অত্যন্ত নিপুন দক্ষতায় লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন কথাকে সাবলীল ভাবে প্রকাশ করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপাদানের পাশাপাশি লোকজীবনের সংস্কার, সংস্কৃতি ও সমাজজীবন আখ্যানকে অপরিহার্যভাবে তুলে এনেছেন ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে। ব্যস্ততাই ভরা নগর জীবনের একতরফা মোহ এবং প্রবণতার থেকে তিনি তাঁর সাহিত্যবোধ চেতনাকে ফিরিয়ে এনেছেন এই রাঢ় বাঙ্গলার নিজস্ব গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে।

অপরপক্ষে, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন দর্শন যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরসঙ্গে ব্যক্তি জীবনের যোগ, বিভূতিভূষণের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দিক-প্রকৃতি ও দর্শন, তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে আঞ্চলিক আটপৌরে জীবনবোধ ও সামন্ত চেতনা যা বাঙ্গলা উপন্যাসকে এক নতুন সূর্যের সন্ধান দিয়েছে।

হাঁসুলী বাঁকের অবস্থান ও উপকরণ সমূহ –

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বিখ্যাত যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।[৩] হাঁসুলী কথার অর্থ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কণ্ঠাভরণ বিশেষ। [বাং. হাঁস+লি, উলি (সদৃশার্থে)]। এক কথায় বলা চলে নারীর কণ্ঠে ধারণের অর্ধচন্দ্রাকৃতি অলংকার। কোপাই নদী (অপর নাম শাল নদী) হল ময়ূরক্ষী নদীর একটি উপনদী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন, বোলপুর, কঙ্কালীতলা ও লাভপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১২ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও এর ঐতিহ্য ও ইতিহাস গৌরবময়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কোপাই নদীকে কাহার কন্যা বলে সম্বোধন করেছেন। প্রায় ৪৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কোপাই নদীর অববাহিকা বিস্তৃত। উৎস অঞ্চলে এই নদী শাল নামে পরিচিত। পরে বোলপুরের বিনুরিয়া গ্রামের কাছে নদীর নাম বদলে হয় কোপাই। আর এই কোপাই নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া। কোপাই ও বক্রেশ্বরের সঙ্গমস্থল থেকে ৪-৫ কিমি দূরে লাভপুরের সন্নিকটে হাঁসুলী বাঁক অবস্থিত।

বাঙ্গলা উপন্যাসের সিদ্ধ কাঠামোর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) মতো কালজয়ী সাহিত্যিকেরা যেমন নিজ নিজ গুনে সাহিত্য প্রতিভার চেতনাকে জীবন্ত রূপে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি রাঢ় বাঙ্গলা তথা বীরভূমের লোককথা বা আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘গণদেবতা’, ও ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসগুলি বেশ জনপ্রিয়। ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন,

> “পল্লীর মাঠে-ঘাটে, পল্লীর আলো বাতাসে, পল্লীর পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে বায়ু সাগরে ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকেও আমাদের মনে হয় না যে এখানে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।”[৪]

ড. শহীদুল্লাহ লোকংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন তা যদি আমরা দৃঢ়চিত্তে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাই, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে শ্রেষ্ঠতর। একটি আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টির নেপথ্যে স্থান-কাল, চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় পরিবেশ ও লোক ভাষার মতো উপাদান গুলি একত্রিত হয়ে সেই অঞ্চলের বিশেষত্বকে জীবন দান করেছে। রাঢ় বাঙ্গলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে অবিকৃত রেখে তিনি যে সুনিপুণ দক্ষতায় উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। একটি আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য যা যা উপকরণ প্রয়োজন তা এই উপন্যাসে পূর্ণ মাত্রায় আছে। তাই এই উপন্যাস প্রসঙ্গে ডঃ শহীদুল্লাহের মতবাদটি সর্বান্তকরণে বিবেচ্য বলেই মনে হয়েছে। রাঢ় বাঙ্গলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে অবিকৃত রেখে ঔপন্যাসিক ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের প্রকৃতি চরিত্রকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। আমরা দেখেছি অনেক কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার তাঁরা তাদের রচনায় কোন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নিজস্ব ভাব ও ভাষাকে সংযোজন করে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তথাকথিত কাহারপাড়া সমাজব্যবস্থা ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে অবিকৃত রেখে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা পাই, এ দেশের এরা মানে

হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালোবাসাকে বলে 'রঙ'। 'রঙ' নয় বলে 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', 'রজনীকে' বলে 'অজুনী', 'রীতকরণকে' বলে 'ইতকরণ', 'রাতবিরেতকে' বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে 'র' থাকলে সেখানে ওরা 'র'-কে 'অ'-করে দেয়।[৫] স্থান, কাল ভেদে যেমন এক এক জাতির নিজস্ব মাতৃভাষা চোখে পড়ে, তেমনি অঞ্চল বিশেষে গড়ে ওঠা উপন্যাসের ধারা ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষা পাঠক মনকেও আলোকিত করে। একটি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান হল ভাষা, যা পাঠক-উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে এক অনাবিল সুপ্ত সম্পর্কে সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসে আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগ এতটাই গুরুত্ব বহন করেছে, যা উপন্যাসের প্রত্যেকটা চরিত্রকে আজও স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় রেখেছে সাহিত্য প্রেমীদের কাছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের নায়ক করালী, নায়িকা পাখি, মাতব্বর বনওয়ারী এবং আদ্যিকালের বুড়ী সুচাঁদ আঞ্চলিক কথ্য ভাষার নিরিখে এখনো পাঠক সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আগামীতেও থাকবে। বীরভূম তথা রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিতে গড়ে ওঠা তারাশঙ্করের সু-লিখিত উপন্যাস গুলির মধ্যে "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"- অন্যতম।

লোক ভাষা বা আঞ্চলিক কথ্যভাষা প্রসঙ্গে গবেষণা করতে গিয়ে উপলব্ধি করা গেল যে, লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। লোকভাষার প্রসঙ্গ এলেই লোকসংস্কৃতি আসবেই। সভ্যতার প্রবাহমান ধারাই হচ্ছে- সংস্কৃতি। তাই লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে ডঃ মানুষ মজুমদার এর মতবাদটি পরিধানযোগ্য,

> "লোক বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না। বোঝয় এমন একদল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা। যারা নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে বাস করে, তাদের আর্থিক কাঠামো একই রকম, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একই ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।"[৬]

ড. মানস মজুমদারের এই মতবাদটির সঙ্গে কোপাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহারপাড়ার মানুষদের জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ বেশ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক বীরভূমের গ্রাম্যরূপ, নদ-নদী, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, গ্রামীণ মানুষদের ধর্ম বিশ্বাস, জমিদারি ব্যবস্থা এবং তথাকথিত রাঢ বাঙ্গলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে সুনিপুণ দক্ষতায় উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। কোপাই নদীর তীরবর্তী বাঁশবাদী গ্রামের জীবন চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। ভৌগলিক রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক 'হাঁসুলী বাঁকের'- নামকরণে গ্রামের অবস্থান বুঝিয়েছেন। মূলত কৃষিজীবী কাহারদের সঙ্গে জড়িত লালমাটি, ধান চাষের মাঠ, কোপাই নদীর দহ, জাঙ্গল গ্রাম, নীলকুঠি, রেল স্টেশন, চন্দনপুর ও গ্রামের পূর্বদিকে রেললাইন ব্রিজ ইত্যাদি উপকরণগুলিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও দেখানো হয়েছে প্রবীণ নেতৃত্ব ও নবীন নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব। কাহার পাড়ার পুরনো ঐতিহ্য কিভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হতে চলেছে; গ্রামের মাতব্বর বনওয়ারির হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারপাড়ায় কারখানায় বাতাস লেগেছে। পিতৃ-পুরুষদের প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি এসেছে অবজ্ঞা। কালের পরিবর্তনে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও যুদ্ধের কারণে গ্রাম ত্যাগ করে তারা শিল্পাঞ্চলে এসে নিজেদের ঐতিহ্য কে হারাতে বাধ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বীরভূমের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থে ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মতবাদটি পরিধানযোগ্য,

> "গ্রামীণ ও আঞ্চলিক শব্দ ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। তার প্রধান কারণ নব্বই দশকের পরের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে টেলিভিশন এসে যাওয়া এবং সিরিয়াল ও নানা নাগরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহুরে কথাবার্তার আচার-আচরণ ও জীবনধারার ব্যাপক অনুসরণ। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা গ্রামের মিষ্টি সরল কথ্য ভাষার পরিবর্তে একটি 'পলিশড' কথাবার্তায় অভ্যস্ত হতে থাকল। 'যেচি', 'খেচি', 'পেচি' - না বলে যাচ্ছি, খাচ্ছি, পাচ্ছি বলে তারা আরাম বোধ করল।"[৭]

সাহিত্যিক ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মতবাদটি বর্তমান সমাজে দৃঢ়সত্য। বর্তমানে টেলিভিশন ও মোবাইল ব্যবহারের ফলে লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষা মৃত্যুর পথে ধাবিত হচ্ছে। মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহুরে আদব-কায়দাকে গ্রহণ করেছে, ফলে জীবন হচ্ছে দুর্বিষহ। গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতা হারাচ্ছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের দেশের সামাজিক পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে যে শ্রেনীগত সচলতার ছবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন, তার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসে। বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন ও লোকভাষাকে উপন্যাস কাহিনীর উপজীব্য করে তারাশংকর-ই প্রথম সমাজ চেতনাকে উপন্যাস শিল্পের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ –

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের মিলন ক্ষেত্র এই রাঢ় বাঙ্গলা তথা বীরভূম। মহর্ষি বিভান্ডক থেকে শুরু করে পদকর্তা জ্ঞানদাস, চন্ডীদাস, জয়দেব ও নিত্যানন্দ প্রভু এবং মাতৃসাধক বামাক্ষেপার চরণ স্পর্শে বীরভূমের লোকজীবনে ধর্মীয় প্রভাব বেশ দৃঢ়। বীরভূমের গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতায় ধর্মীয় প্রভাব এখনো বেশ চোখে পড়ার মত। ধর্মীয় ভাব থেকে জন্ম নিয়েছে লৌকিক বিশ্বাস। আর এই লৌকিক বিশ্বাসই হচ্ছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের কাহার পাড়ার মানুষদের জীবনী শক্তি। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে রাঢ় বাঙ্গলার রূপ বর্ণনার পাশাপাশি লৌকিক পরম্পরাকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগের মধ্যে এক অভিনব জীবন দান করেছেন। রাঢ় বাঙ্গলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন তা পর্যায় ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ঔপন্যাসিক এখানে 'ঝুজকি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারা তিনি রাত্রির শেষ ও ভোরের প্রাক মুহূর্তকে ব্যক্ত করেছেন 'ঝুজকি' নামক আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মধ্যদিয়ে।

> "বাবা ঠাকুরের তলায় ভোর বেলায় 'ঝুঁজকি' ডাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকি ভোরের বাজনা তুমুল বাজাতে শুরু করলে।"[৮]

ঝুজকি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগের পাশাপাশি তিনি সুনিপুণ দক্ষতায় ঢাকের বোলকে উপস্থাপন করেছেন –

> "ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাড্যাং-ড্যাড্যাং-এর্-র্-র্-র্-র্-র্-র্-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং।"[৯]

ঔপন্যাসিক এখানে তৎকালীন সময়ের কলহ সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেছেন। রাঢ় বাঙ্গলার গ্রাম্য পরিবেশে, বিশেষ করে কাহারপাড়ার কলহ সংস্কৃতিকে হাঁসুলী বাঁকের বিশেষত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। কলহের পুরোনো জের থেকে পরে তা অভিশাপের রূপান্তরিত হয়। আদ্যিকালের বুড়ী সুচাঁদের অভিশাপময় তীব্র আক্রমণাত্মক আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন –

> "যে 'অক্তের ত্যাজে' এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবে তোমার। 'গিহিণী ওগ হবে, ছেরউগী' হ'য়ে পড়ে থাকবে।"[১০]

কলহকে তিনি উপন্যাসে প্রথম সংস্কৃতির রূপে তুলে ধরেছেন। সাধারণ ঝগড়া যখন অভিশাপের রূপ নেয় তখন কতটা ভয়ঙ্কর হয় তা আমরা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছি। যেমন-

> "যে গলার ত্যাজে হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ফিরছ, সেই গলা তোমার নাকি হয়ে পাখির গলার মতো ছি চি করবে।"[১১]

ঔপন্যাসিক পাল বাছুরকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর সরল কথোপকথনকে তুলে ধরেছেন। প্রহ্লাদ তাঁর মুনিবের পাল-বাছুরটার সম্বন্ধে পানুর কাছে যে খোঁজখবর নিচ্ছে, তা ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক ভাষায় সুকৌশল লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন–

> "ত্যাজ কেমন হবে বুঝেছিস ওঃ, বেপয়্যয় ত্যাজ! 'লেঙুড়ে' হাত দেয় কার সাধ্যি? পাচন পিঠে ঠেকলে চার পায়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঘুরবে।"[১২]

অপরপক্ষে প্রহ্লাদ জানতে চাইছে পানুর মুনিব পাল-বাছুরটা কিনবে কিনা নতুন গরু কিনবে নাকি তোর মনিব? হ্যাঁ। এবার কিনবে। তিন বছর ব'লে ও বছর আজী করালছি।[১৩] আঞ্চলিক কথ্য রচিত ভাষায় প্রহ্লাদ ও পানুর কথোপকথন যে পাঠক মনে বেশ রস-সঞ্চার করছে ও করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কাহার পাড়ার বাঁশবনের তলায় লুকিয়ে থাকা অন্ধকার ও অন্ধকার জগতের পরিবেশকে সাহসী মনে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। যেমন –

"তক্ষক ডাকে টক্ টক্ শব্দ করে, প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে, আবার গভীর রাতে ডাকে হুম হুম পাখি, বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-নাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা।"[১৪]

তক্ষকের ডাক, প্যাঁচার ডাক, হুম হুম শব্দে পাখির ডাক, শেওড়া-শিমুলের মাথায় শাঁকচুন্নির ডাককে ঔপন্যাসিক যেভাবে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন তার থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ঔপন্যাসিক অনেকাংশে প্রকৃতিপ্রেমিক ও সাহসী ছিলেন।

ফাল্গুন সংক্রান্তি, ঘেঁটু গাছের অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ঘেঁটুষষ্ঠী পালন করা হয়। কুষ্ঠ ও বসন্তকালে খোস প্যাঁচড়া নামক চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ঘেঁটু উৎসবে সবাই সামিল হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এই ঘেটুষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ঘেঁটুগানের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদনদী, পল্লী বাংলার বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে ঘেঁটুগান বাঁধা হত; বর্তমানে এই ঘেঁটুগান বিলুপ্তির পথে। ঔপন্যাসিক লুপ্তপ্রায় এই ঘেঁটুগানকে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহার সমাজের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুনিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' মৃত চন্দ্রবোড়া সাপকে নিয়ে ঘেঁটুগান বেঁধেছে আটপৌরেরা -

"বিচার নাহিক বাবা পুরিল সাপের ভারা
সাজের পিদীম বলো ফুঁদিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের ও কি লীলা সনজে বেলাতে।
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় কি গালাগালি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলিঢলি!
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সনজে দেখালে
হায় কলিকালে।"[১৫]

পাগলের রচিত ঘেঁটুগান -

"লাল মুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ-
দ্যাশ-বিদেশ থেকে এল দলে দলে লোক-
-ও সাহেব আস্থা-
-ও সাহেব আস্তা বাঁধলে- কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে
পালকি ছেড়ে অ্যালে চড়ে যত বাবু লোক!
- ও সাহেব আস্তা-"[১৬]

এই উপন্যাসের নায়ক করালী খুবই সাহসী এবং বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন। কাহারপাড়ার কুসংস্কার তাকে যেন স্পর্শ করতে পারেনি। সে যেন স্বতন্ত্র ও মুক্ত। করালীর একঘেয়েমি জীবনে শহুরে বাতাস লাগার পর তাঁর জীবন চর্চার পরিবর্তনকে কাহারদের আঞ্চলিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। যেমন –

"ছোঁড়ার একটা দোষ হ'ল, 'লবারী' করা, অ্যাই টেরি, অ্যাই জামা, অ্যাই কাপড়, অ্যাই একটা 'টরচ' আলো, একটা বাঁশী, যেন বাবুর বেটা বাবু বেড়াচ্ছে, কে বলবে কারদের ছেলে! মুখে লম্বা লম্বা কথা।"[১৭]

করালীর এই শহুরেপনা বা লবারী অর্থাৎ নবাবী পনাকে কাহারপাড়ার মানুষেরা ভালো চোখে গ্রহণ করেনি; কারণ তাদের একঘেয়েমি জীবনে ছিল অন্ধ কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাস। অপরপক্ষে করালী হেঁপো রোগী নয়নের বউ পাখিকে সাঙ্গা অর্থাৎ বিবাহ করেছে। পাখিকে করালী নয়নের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় নয়নের মায়ের মনে খুব রাগ জন্মেছে। প্রবল ঝরে করালীর বাড়ির ছাউনি উড়ে গেলে করালীর প্রতি নয়নের মায়ের সাপশাপন্ত যে তীব্র আকার ধারণ করেছে, তা ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় সুনিপুণ দক্ষতায় বিকশিত করেছেন। যেমন–

> "হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্ট দুষ্ট বজ্জাতের মাথায় ফেলো বাবা। কড় কড় করে ডাক মেরে হাঁক মেরে ফেলে দাও বাজ। পুড়ে ফেটে মরে যাক ছটফটিয়ে। হে বাবা! হে বাবা।"[১৮]

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' নীলকর সাহেবদের আচার ব্যবহার, তাদের শারীরিক গঠন ও বাক্যালাপকে কাহারপাড়ার বুড়ী সুচাঁদ গল্পের ছলে বর্ণনা করেছেন, যেমন –

> "সায়েব লোক, রাঙা রাঙা মুখ, কটা কটা চোখ, গিরিমাটির মতো চুল, পায়ে অ্যাই বুট জুতো, ঘটমট ক'রে বেড়াত, পিঠে প্যাটে জুতো শুদ্ধ লাথি বসিয়ে দিত, মুখে কটমট হিন্দি বাদ মারডালো, লাগাও চাবুক, দেখলাও শালো, লোগকো সায়েব লোকের প্যাঁচ।"[১৯]

এই প্রসঙ্গে আমরা ঔপন্যাসিকের দৃঢ়চেতা মানসিকতায় পরিচয় পায়। যার দ্বারা তিনি আঞ্চলিক অর্থভাষাকে অপরিবর্তিত রেখে পাঠকমলে উপস্থাপন করেছেন। নয়নের মা এবং করালীর নসুদিদি একত্রিত হয়ে প্রাণকেষ্টর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। প্রানকেষ্ট ওরফে পানুর বউ নসুকে গালাগাল দিয়ে চলেছে-

> "ওলো বেটাখাকী লো, অলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বেটিলো - তোর মুখে আগুন দি-লো— "[২০]

এই কলহ পর্বে পানুর বইয়ের গালাগালির পরিপ্রেক্ষিতে নসুবালা গালাগাল শুরু করেছে –

> "নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি করে নেচে নেচে খালে পুঁতব, নোকের ভাতার মরবে, ওই নাই, বালাই নাই, ধরফরিয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই করে নাচব।"[২১]

এই কলহ বিবাদকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় অপরিবর্তিত রেখে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসকে এক আলাদা মাত্রা দিয়েছেন। রাঢ় বাঙ্গলার আটপৌরে সমাজ জীবনে কলহের স্থান কতটা জায়গা অধিকার করে আছে তা তিনি পাঠক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক নসুবালা ও পাগল এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসকে জীবন্ত করে রেখেছেন। নসুবালা পুরুষ হয়েও মেয়েলি স্বভাবের, অপরদিকে পাগল ভবঘুরে। নসুবালা ও পাগলের ঐশ্বরিক গুণ তারা কথায় কথায় আঞ্চলিক ভাষায় গান বাঁধতে ও বাঁধা গান সুর দিয়ে পরিবেশন করতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা অনুমান করতে পারি যে ঔপন্যাসিক পাঠকের মনোসংযোগ ধরে রাখার তাগিদে এবং উপন্যাসকে আরো চিত্তাকর্ষক করার জন্য নসুবালা ও পাগল চরিত্র দুটিকে স্বমহিমায় তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি কলহ সংস্কৃতি ও সংগীত প্রতিবার দ্বারা নসুবালা চরিত্রটি পাঠক মনে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। রাত্রে আয়না দেখাকে কেন্দ্র করে বুড়ী সুচাঁদ যখন নসুবালাকে কলঙ্কের কথা বলে, এবং সমস্ত মেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়লে নসুবালা গান ধরে —

> "লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে-
> কলঙ্কিনী রাইমানিনী- নাম রটেছে দ্যাশে।"[২২]

এই গানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবঘুরে পাগল কাহার হঠাৎ সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে -

> "শ্যাম কলঙ্কের বালাই লোয়ে -
> ঝাঁপ দিব সই কালিদহে;
> কালীলাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাষে!"[২৩]

নসুবালা ও পাগলের বাঁধা গানের পংক্তি গুলিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ কতখানি বিস্তার লাভ করেছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে।

কাহারেরা যখন বর ও কনেকে নিয়ে পালকি করে বাড়ি ফেরে তখন বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে দুই পালকি বাহকদের মধ্যে এগিয়ে চলার যে প্রতিযোগিতা হয় তা ঔপন্যাসিক খুবই সুক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বরের পালকি আগে যাবে নাকি কনের পালকি আগে। পালকি বাহকেরা উদ্যামের সঙ্গে এগিয়ে চলার জন্য গান ধরে। হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ার আদ্যিকালের গান গাইতে গাইতে তাঁরা ফেরে। গান গাইতে পাগল কাহারের জুড়ি নাই। পাগল হাসতে হাসতে সুর করে এবার বলে বরেরো পাল্কী। প্লো-হিঁ-প্লো-হি! পড়িল পিছনে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"- প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ-
- আগে চলে লক্ষ্মী-
- প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ-
- পিছে এলো নারায়ন।"[২৪]

বর ও কনেকে নিয়ে বাড়ির পথে আসার সময় আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত কাহারপাড়ার পূর্বপুরুষদের তৈরি এই গান এখনো পাঠক মনকে আলোকিত করে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' কাহারপাড়ার মানুষেরা নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে। বাবা কালারুদ্দুরকে ভোগ দিয়ে নব অন্নের 'দব্য পস্তত' করে আনন্দ করে খাওয়ায়। এই নবান্ন উৎসবে তাঁরা কালারুদ্দকে উদ্দেশ্য করে ছড়া বলে-

" 'ল' লাড়লাম - 'ল' চাড়লাম
'ল' পুরোনোয় ঘর বাঁধলাম।
লতুন বাখার বাঁধি পুরানো খাই - এই খেতে যেন জনম যায় -
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন -
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।"[২৫]

আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত ছড়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহার পাড়ার নবান্ন উৎসবকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। নবান্ন অর্থাৎ নতুন অন্ন, পাশাপাশি ধান গাছের মৃত রূপ অর্থাৎ খড় তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই নতুন খড় দিয়ে কাহারপাড়ার মানুষেরা ঘরের ছাউনি দেয়, আবার নতুন ধান মজুত করে রাখার জন্য বাখার অর্থাৎ মরাই প্রস্তুত করে। কাহার পাড়ার মানুষেরা 'ন'-কে 'ল' উচ্চারণ করে। 'ন' - অর্থাৎ নতুন। (ন>ল=বিষমীভবনের উদাহরণ) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' - সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কালকে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়।

> "প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়; একে বলে-ঝিকিমিকি বেলা। মেঘ কেটে গিয়ে লাল আলোয় ভরে গেল আকাশ। 'চাকি' অর্থাৎ অস্তোন্মুখ সূর্য এখনো ডুবে নাই; পাটে বসে লাল বরণ রূপ নিয়ে হিলহিল করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে। আকাশের মেঘে লাল রঙ ধরেছে।"[২৬]

প্রকৃতি প্রেমিক কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমরা ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি প্রেমের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাই। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন -

"ভোরের দোয়েল পাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট- কাঁঠালের-হিজলের অশথের ক'রে আছে চুপ।"

ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক কথ্য ভাষায়, অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশ চলিত বাঙ্গলায় প্রকৃতির রূপকে বর্ণনা করেছেন।
ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পিত্তি পড়ে, অম্বল ও জ্বর হয়। এই জ্বরের উপসর্গ ও পথ্যের নামকে ঔপন্যাসিক যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তা সত্যিই অতুলনীয়। যেমন – 'বৈদ্যরা বলে- পুরাতন জ্বর; ডাক্তার বলে-'ম্যালোয়ারী' কম্প দিয়ে জ্বর আসে, গলগল ক'রে পিত্তি বমি করে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। 'কুনিয়ান' খায়, পাঁচ সাতদিন পর পথ্য পায়, বিছানা ছেড়ে ওঠে, আবার পনেরো-বিশ দিন পর পড়ে।"[২৭] কাহার পাড়ার মানুষেরা 'ম্যালেরিয়া'-কে বলে 'ম্যালোয়ারী', 'কুইনাইন'-কে বলে 'কুনিয়ান'।

উপসংহার –

আঞ্চলিক জীবনের চিত্রকর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহারদের আটপৌরে জীবনের বলিষ্ঠ রূপকে রাঢ় বাঙ্গলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে এক অভিনব জীবনদান করেছেন। লৌকিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে কাহারদের জীবন সংস্কৃতি ও কথ্য ভাষা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে পরিগণিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 219 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিখুঁত ছবি এই উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করি। রাঢ় বাঙ্গলার গ্রাম্য জীবন,নদ-নদী, প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং দলিত সমাজের সংস্কৃতি ও জীবনবোধকে তিনি আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে যেভাবে বাঙ্গলা উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়েছেন তা এক কথায় অনবদ্য। এই উপন্যাসে যে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গের অবতারণা করেছেন তা অন্য লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। ভয়ংকর আদিমতান্ত্রিক ঐতিহ্য, প্রেম-পরকীয়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা, বিরহ-বিচ্ছেদকে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'- উপন্যাসে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে বলতে হয় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস অভিধায় ভূষিত। আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত সংলাপ গুলি যেভাবে এই উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে, তাতে করে এই উপন্যাসটি কয়েক যুগ পাঠক মন অধিকার করে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিশেষে পাগল কাহারের গান দিয়ে উপসংহারের ইতি টানছি -

"হাঁসুলী বাঁকের কথা- বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে- কথা ভেসে যায়।"

[অঙ্ : রঙ, আম : রাম, ইতকরণ : রীতিকরন, আতবিরেত : রাতবিরেত, হাঁসুলী : অর্ধচন্দ্রা বিশেষ গহনা, ঝুঁজকি : ভোরের পূর্ব মুহূর্ত, ত্যাজে : রাগে, ওগ : রোগ, অক্ত : রক্ত, ছেরউগী : কলেরা রোগী, বেপয্যয় : ব্যাপক, লেঙ্গুড়ে : লেজে, লতুন : নতুন, বা-নাউলি : অপদেবতা, আটপৌরে : অষ্টপ্রহর, সনজে : সন্ধ্যা, ঢলাঢলি : ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সায়েব : সাহেব, প্যাটে : পেটে, লষ্ট : নষ্ট, ক্যাশে : কেশে, দ্যাশে : দেশে, অবশ্যাষে : অবশেষে, বাখার : মরাই (ধান রাখিবার গোলা), দব্য : দ্রব্য, লবারী : নবাবী, সাঙ্গা : বিবাহ, ম্যালোয়ারী : ম্যালেরীয়া, কুনিয়ান : কুইনাইন।]

Reference:

১. হক, মহম্মদ এনামুল, লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, (১ম খণ্ড), সম্পাদক - শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, পৃ. ১৩
২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, আদিবাসী লোককথা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০১ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-৯, পৃ. ১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ৫
৪. সিদ্দিকী, ড. আশরাফ, লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স ঢাকা, পৃ. ১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ১৪
৬. ড. নিত্যানন্দ, মণ্ডল, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রঃ লিঃ পৃ. ১
৭. বীরভূমের লোকসংস্কৃতি, সম্পাদনা-দেবাশিস সাহা, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ১৩৪
৮. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ৪৫
৯. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ৪৫
১০. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ৬১
১১. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারুলতা প্রকাশন, পৃ. ৬১
১২. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ৬৬
১৩. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ৬৬
১৪. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ৮৩
১৫. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ৮৯
১৬. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১৪৭
১৭. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১৪৭
১৮. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১১২

১৯. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ২৪৩
২০. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১০১
২১. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১২৭
২২. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১২৭
২৩. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১৩৯
২৪. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১৩৯
২৫. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ১৬৪
২৬. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ২০৮
২৭. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, চারলতা প্রকাশন, পৃ. ২২৯